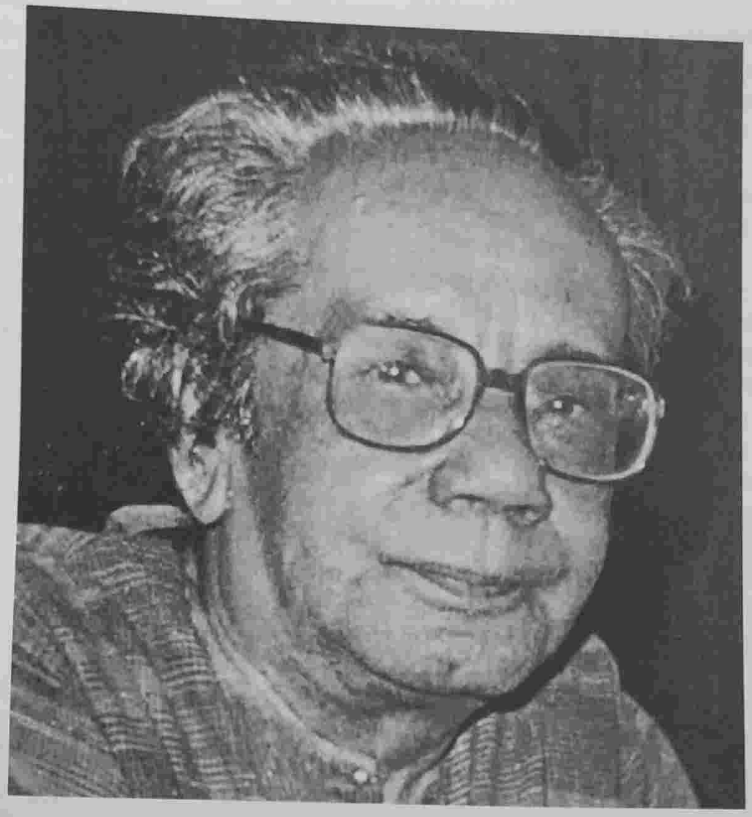

ব্যতিক্রমী জীবনের কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শান্তি সিংহ

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজেকে 'বক্তব্যজীবী লেখক' পরিচয় দিলেও তিনি গভীর জীবনবাদী, রসজ্ঞ কথাশিল্পী। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের তিনি সমকালীন, অথচ স্বতন্ত্র প্রতিভায় উজ্জ্বল। তাঁর জীবনবোধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলাম ও হিন্দু সংস্কৃতির ভাস্কর্য মেলবন্ধন ঘটেছে। প্রসঙ্গত, আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে তাঁর প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণীয় : 'পশ্চিমি ধ্রুপদী সংগীতের রেকর্ড শোনাতেন। একদিন বিঠোফেনের ছ'টা সিম্ফনি শুনিয়ে জানতে চাইলেন মনের কী সব অনুভূতির সৃষ্টি হল। বললাম। উনি আমাকে রেকর্ডের কভারগুলো পড়তে দিলেন। অবাক হয়ে দেখি, সিম্ফনিগুলোর ভাব অবিকল আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।' ফলে তাঁকে তারাশঙ্কর-পরবর্তী রাঢ়-বাংলার একজন সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে শুধুমাত্র দেখা — সঠিক নয়, বলা বাহুল্য। *আত্মকথায়* সিরাজ স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তোমার শরীরে পবিত্র পুরুষ হজরত মুহম্মদের রক্তধারা আছে। আমরা সৈয়দ বংশীয়। দাদুর দাদু ফারসি ভাষায় যে ডাইরি বা রোজনামচা লিখেছিলেন, তার বিবরণ বিস্ময়কর। আমাদের পূর্বপুরুষ খোরাসানবাসী। সেমেটিক রক্তধারার সঙ্গে আর্য রক্তধারা মিশে গিয়েছিল।... এহেন পরিবারের বিষয়বৈভব বলতে যা ছিল, তা শুধু কেতাব। রাশিকৃত গ্রন্থ।... আরবি, ফারসি, উর্দু প্রকাণ্ড সব বই। তার অনেকগুলোই হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি।... বাবা এই ঐতিহ্যের মূলধারাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

গান্ধীজির ডাকে নন-কো অপারেশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জেল খাটেন। তারপর আমাদের পরিবারটি হয়ে উঠল রাজনৈতিক পরিবার। দাদুও ওহাবী আন্দোলনের কড়া সমর্থক এবং গোঁড়া ফরাজী ছিলেন।... মা আনোয়ারা বেগম কবিতা ও গল্প লিখতেন। বিচিত্রা-বঙ্গলক্ষ্মী-সওগাত-গুলিস্তাঁ ইত্যাদি সে-সময়কার কলকাতার অজস্র পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুত। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে চিঠিতে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ফজলুল হক সেলবর্ষীর লেখা অনেক চিঠি তাঁর কাছে দেখেছি। পরে এই ভদ্রলোক রাজসাক্ষী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তখনই বন্ধ হয়ে যায়। ছোটবেলায় দেখেছি — ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজঃফর আহমদকে আমাদের মাটির বাড়ির দোতলায় লুকিয়ে থাকতে। তখন উনি ছিলেন আন্ডার গ্রাউন্ডে।'

সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী ও আনোয়ারা বেগমের বড় ছেলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবর জন্ম। ন-বছর বয়সে সিরাজ মাতৃহারা। *আত্মকথায়* সিরাজ লিখেছেন, 'ওই বয়সে মা'র মৃত্যু হল। কিন্তু এ মৃত্যু আমাকে ছুঁল না। প্রকৃতি আমাকে কেড়ে নিয়েছেন কবে — আমার আসল মা যে তিনিই! আশ্চর্য নির্বিকার থেকে গেলাম। বিধবা মাসী — মা হয়ে বাড়ি এলেন। একলিমা বেগমও দিদির মতো সাহিত্য-অনুরাগিণী।' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আট ভাইয়ের বড়। বাবার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত অন্যান্য ভাই — আনোয়ার আলম, সৈয়দ শামসুল আজাদ ও সৈয়দ মতিন হায়দার। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত তাঁর ভাইয়েদের নাম — সৈয়দ খালেদ নৌমান, সৈয়দ কওসর জামাল, জমিল সৈয়দ ও সৈয়দ হাসনাত জালাল। লক্ষণীয়, সিরাজের সব ভাই সাহিত্যিক গুণযুক্ত। তাঁর স্ত্রী হাসনে আরা বেগম খোশবাসপুর গ্রামের কাছে গোকর্ণের মেয়ে। *লাল শিমুলের দিন* কাব্যগ্রন্থের কবি। আদর্শ গৃহিণী।

নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছে শীর্ষক আত্মকথায় সিরাজ লিখেছেন, 'জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশে সারা এলাকা জুড়ে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অনেক দুর্ধর্ষ-হিংস্র মানুষ ছিল, যাদের দু'চোখে ছিল হত্যার নেশা।... কথায় কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষী, বাগদী, গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। অবিকল যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে সশস্ত্র সৈনিকদের মতো তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হত।... এই দুর্ধর্ষ, আদিম জীবনকে আমি ভালবাসতাম। তা পেতে চাইতাম। এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড় আদিম সেই জগত। প্রাণী ও উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উইঢিবি, শ্যাওলা-ছত্রাক, পাখির গু, শাপের খোলসে-ভরা সেই আদিম স্যাঁতসেঁতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটি বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি — সে এক পৃথিবী আছে, দুর্গম, রহস্যময় — যেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোনো পৃথক মূল্য নেই। সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা... শুধু আছে জীবন — মুক্ত-উদ্দাম জীবন। এই জীবনকে আমি দেখেছি। ভালবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি।'

সিরাজের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *নীলঘরের নটী* (১৯৬৬)। তারপর *হিজলকন্যা* (১৯৬৭), *তৃণভূমি* (১৯৭০), *মায়ামৃদঙ্গ* (১৯৭২), *উত্তর জাহ্নবী* (১৯৭৪), *নিলয় না জানি* (১৯৭৬) প্রভৃতি উপন্যাসে রাঢ়-বাংলার নিসর্গপ্রকৃতির উদ্দাম বন্যভাব এবং প্রান্তিক মানুষের বিচিত্র জীবনধারা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় উজ্জ্বল। তাঁর দেখা দুরন্ত গেছোমেয়ে *হিজলকন্যা* — যাদের দুরন্ত ভালোবাসার আবেগে ছিল লজ্জা-দ্বিধাহীন প্রকাশ। হিজরোল, ময়নাডাঙা, মরাডুংরি, ধুলোউড়ি, সোনাটিকুরির বিস্তীর্ণ প্রান্তিক জীবন ও নিসর্গ প্রকৃতির সজীবতা *তৃণভূমি* উপন্যাসে চিত্রিত। নিশানাথের চোখে — 'সারা তৃণভূমিকে মনে হয় জীবন্ত — কোষে কোষে তাজা রক্তমাংসের মতো অনুভূতি... সজীব সতর্ক সব কিছু। পশুপাখি, কীটপতঙ্গের জীবজগত সেই বিস্তৃত আর সজীব কোষে কোষে বিন্যস্ত সত্তার অংশমাত্র — গাছের ফুল-ফলের মতো একটা প্রস্ফুটিত পরিণতি।'

সিরাজ তাঁর প্রথম যৌবনে আলকাপদলে থাকার সুবাদে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, দুমকা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকজীবন প্রত্যক্ষ করেন। তখন আলকাপের নামকরা মানুষ ধনঞ্জয় সরকার, ওরফে ঝাঁক্সা বা ঝাঁক্সু ওস্তাদ। জঙ্গীপুর শহরের ওপাশে ভাগীরথী তীরের ধনপাত নগরের বাসিন্দা ঝাঁক্সু। বিহার থেকে আসা নিম্নবর্ণ সমাজের দিয়াড়ি হিন্দুস্তানি। তাঁর মাতৃভাষা খোট্টাই চাঁইবেলি। তবু তিনি বাংলাভাষায় ছিলেন সাবলীল। আলকাপের সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সিরাজের। তিনি সিরাজকে বলেন, 'মায়া নামে একটা জিনিস আছে... কাল রাতে আসরে দেখেছেন, চৌদ্দটি বাতি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। মানুষ জুটেছিল হাজার পাঁচের কম না। ওই আসরে জিনিসটা ছিল — মায়া। ছোকরা নাচিয়ে সাজ খুলল। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড দেখুন — মোহিনী নটীর নাচ থামল না।... এ যেন খড়-মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে, রং মাখিয়ে, চোখ এঁকে, সাজ পরিয়ে পুজো। মনের ভেতর আছে এক মোহিনী নটী। তাকে পুরুষের শরীরে রূপ দিই।' *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে আছে সিরাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহিত্যরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবগ্রাম-জোঁগ্রাম স্টেশনের কাছে ময়না গ্রামের গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সিরাজ তাঁর সাঁওতাল বন্ধু কালিয়ার কাছে বাঁশের বাঁশি বাজানো শেখেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর আলকাপের অভিনয়ে নতুন মাত্রা আনে। *আত্মকথায়* তিনি লেখেন, 'আলকাপ দলের কিশোর ছোকরার কোমরদোলানি ও ভাঙ্গা গলার গান এবং একই সঙ্গে নৃত্যকুশলী নগরনটীর জটিল মুদ্রানিচয় কেন আমাকে সমান আবেগে আক্রান্ত করে? এর কারণ হয়তো আমি সেই সুপ্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী, যা বলে : মানবিক যা কিছু, তাই নির্বিচারে সুন্দর। মানুষের পাপ সুন্দর, পুণ্য সুন্দর। তার রক্ত, অশ্রু, সুখ, দুঃখ — সবই সুন্দর।'

সিরাজের উপন্যাসে আছে বাস্তবজীবনের মিথের (Myth) আলিঙ্গন — এক আলো-আঁধারি ছায়া, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মায়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোৎস্না-আলোকিত নির্মল নিসর্গপ্রকৃতি, শৈশবের অপাপবিদ্ধতা থেকে বহু দূরে, এক আদিম তমসাময়ী রাত্রির যুগপৎ উদাসীনতা ও হিংস্র আবেগ দেখেছেন সিরাজ। তাঁর দেখা রাঢ়ের লোকজীবনে তারাশঙ্করের রসকলি-আঁকা বৈষ্ণবী নয়, জৈবিক প্রবৃত্তির আদিমতার বুকে ছন্দিত হয় শরীরী কামনা-বাসনা। তার পাশে ফুটে ওঠে হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউলের আততি। মদনচাঁদ ফকিরের মুখে শোনা গান, মাদারপীরের মেলায় —

তিরপিনীর ঘাটেতে এক মড়া ভাসতেছে
মড়ার বুকে সর্পের ডিম্ব
হরিণ চরতেছে।

জরথুস্ট্রীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামিতত্ত্বের মিলনে সুফি মতবাদ। চর্যাপদের সাধনতত্ত্বে যেমন শবর-শবরী, হরিণ-হরিণীর কথা, তেমনি মারফতিতত্ত্বে শবরূপ মহাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড। সেখানে সর্পবৎ বাসনার ডিম্ব। সেই ডিম্বের ভেতর পরম রূপবান

ও পরম রূপবতী হরিণ ও হরিণীর বাস। তাদের মিলনেই জীবন। বিরহে মৃত্যুরূপী লয়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্ব, তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে সুফিভাবনা, পীর-ফকিরের বিচিত্র জগতের মাঝে আদিম জৈবিক প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশ ঘটে তাঁর *নিলয় না জানি* উপন্যাসে।

দুই

১৯৫০ সালে সিরাজ বিএ পাশ করেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। তখন মেদিনীপুরের পানিপারুলে কয়েক মাস সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। তারপর কলকাতায় ইত্তেফাক পত্রিকায় সহসম্পাদক হন। ১৯৪৯ সালে *দেশ*-পত্রিকায় লেখেন 'আমার বাউলবন্ধুরা' নিবন্ধ। ১৯৫০-এ *দেশ*-পত্রিকায় বের হয় তাঁর কবিতা — 'শেষ অভিসার'। একই বছরে ইবলিশ-ছদ্মনামে লেখেন প্রথম গল্প — 'কাঁচি'। তা বহরমপুরের *সুপ্রভাত* পত্রিকায় প্রকাশিত। সবিশেষ উল্লেখ, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখেছেন। ওই সময় কলকাতায় থাকতেন। কবি বিষ্ণু দে মহাশয়ের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসুর ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাসায় গিয়ে দেখা করেন। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তখন বামপন্থী লেখকশিল্পীদের আড্ডাস্থল হয় কলকাতার বেকবাগান রো। সেই আড্ডায় সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকের সঙ্গে মিশেছেন সিরাজ। তিনি বরাবর পার্টি কমিউনে থেকেছেন। তখন আইপিটিএ থেকে পরিকল্পনা হয় — লোকসংস্কৃতির পথ ধরে এগোতে হবে। পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যান সিরাজ। লোকনাট্য আলকাপে যোগ দেন। তাঁর জীবনে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ আলকাপ লোকনাট্যের কাল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও লোকনাট্য আলকাপে থাকার সময় ১৯৫৬ সালে হোসনে আরা বেগমের সঙ্গে স্বল্পকালীন প্রেম থেকে পরিণয়। হোসনে আরা বেগম স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমার শ্বশুরমশাই আমাকে বিয়ের পরই বলেছিলেন, মা, তোমার উপর আমার ছেলের দায়িত্ব দিলাম। ওকে ঘরে ফেরাবার ব্যবস্থা করবে। ও যেন আর গান-বাজনা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে না যায়।... ওর (স্বামীর) ঘরে দেখলাম প্রচুর গল্প আর কবিতার খাতা। মনে মনে ভাবলাম — যার এত লেখালেখির ঝোঁক, তাহলে কেন সে গানের দল নিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাবে। আমি বললাম — তুমি সাহিত্যিক হবে, তাহলে গান-থিয়েটার ছেড়ে, লেখায় মন দাও। গল্প লেখ, ছোটগল্প। তোমার লেখার অসুবিধে যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি শুধু লিখবে। সে বাধ্য ছেলের মতো আমার কথা শুনত।... (সিরাজের) প্রথম লেখা উপন্যাস *কিংবদন্তীর নায়ক*। প্রথম পাঠক আমি। এরপর তার বই ছাপা হতে লাগল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে নিয়ে গেল আমাদের।' (*সে ছিল এক মহান মানুষ*)।

১৯৬২ সালে, *দেশ*-পত্রিকায় সিরাজের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন'। ১৯৬৯ সাল থেকে *আনন্দবাজারে* (পত্রিকায়) নিয়মিত লেখালেখির সুযোগ হয়। ১৯৭১ সালে *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকরিপ্রাপ্তি। ১৯৭৯ সালে আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্তি। ১৯৮০ সালে চার মাসের আমন্ত্রণে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে যোগদান। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত *অলীক মানুষ*। উপন্যাসটি ১৯৯০ সালে ভুয়ালকা পুরস্কার পায়। এই ধ্রুপদী উপন্যাসটি ১৯৯৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি ও বঙ্কিম উপন্যাস-ধন্য হয়। ২০০৮ সালে *অলীক মানুষ* উপন্যাসটি আন্তর্জাতিক সুরমা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট সম্মাননা জানায়। ২০১০ সালে তিনি বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এই মহান সাহিত্যস্রষ্টার মহাপ্রয়াণ ঘটে কলকাতায়। পরদিন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় প্রিয় জন্মস্থান খোশবাসপুরে। আবাল্যপ্রিয় নিসর্গপ্রকৃতির বুকে পরম নিভৃতির আশ্রয় পান।

তিন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রায় আড়াইশো বই লিখেছেন। সে-সব বই মূলত উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোরদের রহস্য উপন্যাস। তিনি ব্যতিক্রমী ধারার সার্থক উপন্যাসলেখক। পূর্বোক্ত উপন্যাসের সঙ্গে *বন্যা*, *নিশিমৃগয়া*, *নিষিদ্ধ প্রান্তর*, *প্রেম ঘৃণা দাহ*, *কামনার সুখ-দুঃখ*, *আসমানতারা*, *সীমান্ত বাঘিনী*, *কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি*, *হেমন্তের বর্ণমালা*, *বসন্ততৃষ্ণা*, *নিষিদ্ধ অরণ্য*, *নটী নয়নতারা*, *প্রেমের নিষাদ*, *হিজলকন্যা* প্রভৃতি অনেক উপন্যাস আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সিরাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *অলীক মানুষ*। এই উপন্যাস লেখার প্রস্তুতিপর্বে ইতিহাস দর্শন, সাহিত্য, নানা ধর্মের ধর্মশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর তিনি গভীর পড়াশোনা করেছেন। *চতুরঙ্গ* পত্রিকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রায় আড়াইশো বই লিখেছেন। সে-সব বই মূলত উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোরদের রহস্য উপন্যাস। তিনি ব্যতিক্রমী ধারার সার্থক উপন্যাসলেখক।

আমন্ত্রণে *অলীক মানুষ* উপন্যাস লেখা শুরু করেন। আটটি পরিচ্ছেদ লেখার পর তিনি *চতুরঙ্গ* সম্পাদককে লেখায় বিরতি টানার কথা জানান। প্রীতিভাজন সম্পাদক আবদুর রাউফ সম্প্রতি ফোনে *অলীক মানুষ* লেখার পটভূমিতে সে-কথা সমর্থন করেন। তখন *চতুরঙ্গ*-সম্পাদকের সনির্বন্ধ অনুরোধে, উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে আরো অনেকদিন লেখার জন্য সিরাজ গভীরমনস্কচিত্তে নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাসের পাশাপাশি হোমার-দান্তে-ওভিদ-নিৎশে-বোদলেয়ার, গ্যেটে, সফোক্লিস-প্লেটো-বৃহদারণ্যক উপনিষদ-কঠোপনিষদ-হাফিজ প্রভৃতি বিশ্বের সাহিত্যগ্রন্থ পাঠে নিরত হন। এই গ্রন্থরচনার প্রেক্ষিতে জানান, 'আমার মনে শুধু এটুকু চিন্তা ছিল ব্যক্তিজীবনকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে স্থাপন এবং বিমূর্তায়ন।... এই উপন্যাসে আমি অনেক দেশি-বিদেশি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি — সে-সব উদ্ধৃতি ভাষায় বিভিন্ন। আমি কখনই পণ্ডিতি দেখাতে চাইনি। আসলে বিমূর্তায়নের প্রয়োজনে উদ্ধৃতিগুলিকে আবহসংগীত হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি।'

বদু পীর জীবনস্রোতে যেন মহামানব থেকে অলৌকিক হয়ে যান। তাঁর পুরো নাম সৈয়দ আবুল কাসেম মুহম্মদ বদিউজ্জামান আল-হুসেইদি আল-খুরাসানি। তাঁর পুত্র শফিউজ্জামান ঘটনা পরম্পরায় ধর্মদ্রোহী থেকে নৈরাজ্যবাদী, পরিণামে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নিষ্ঠুর ঘাতক। লৌকিক-অলৌকিক, মায়া-বাস্তবতা মেশানো এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখক সিরাজ বলেছেন : 'অলীক মানুষ' বলতে আমি বুঝিয়েছি 'মিথিক্যাল ম্যান'। রক্তমাংসের মানুষকে কেন্দ্র করে যে মিথ গড়ে ওঠে — সেই মিথই (myth) একসময় মানুষের প্রকৃত বাস্তব সত্তাকে নিজের কাছে অস্পষ্ট এবং অর্থহীন করে তোলে। ব্যক্তিজীবনের এই ট্র্যাজেডি *অলীক মানুষের* মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।... নিজের খুশিমতো নিজের আনন্দে লিখে গেছি। সেদিক থেকে দেখলে এই উপন্যাসের লেখক হিসাবে আমাকে অন্যতম নায়ক শফিউজ্জামানের মতোই স্বেচ্ছাচারী বলা যায়।'

শেষ থেকে শুরু হয় এই উপন্যাস — 'দায়রা জজ ফাঁসির হুকুম দিলে আসামি শফিউজ্জামানের একজন কালো আর একজন সাদা মানুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল।' কাঁটালিয়া-পোখরা-বিনুটি-গোবিন্দপুর-নবাবগঞ্জ-কুতুবপুর-খয়রাডাঙা-মোল্লাহাট — এই সব গ্রাম থেকে গ্রামে সংসার গেরস্থালি নিয়ে ঘুরেছেন বদিউজ্জামান। তার পেছনে কোনো দার্শনিক অনিকেত ভাবনা নেই, তা শিকড়হীন মানুষের জঙ্গমতা। অথচ বদু পীরকে দেখতে পেয়ে, মোল্লাহাটের 'লোকগুলির মুখে চোখে ঐশী নিদর্শন অনুসন্ধানের প্রচণ্ড আকুলতা, আর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশে। তারা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির আর শব্দহীন। দিঘির উঁচু পাড়ে শাহী মসজিদের প্রান্তের একখণ্ড পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন বদিউজ্জামান। ঐখানে কোনো বৃক্ষলতা নেই। চৈত্রের নীল ধূসর আসমানের গায়ে আঁকা সাদা আলখেল্লা আর সাদা পাগড়ি-পরা মূর্তিটিকে দেখে মনে হয় — ঐ মানুষ দুনিয়ার নন।'

উপন্যাস জুড়ে আছে দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য জগতের দ্বন্দ্ব। মানুষ বদিউজ্জামান ও সাধক বদু পীরের দ্বন্দ্ব। বাস্তব-অলীকের সংঘাত, লৌকিক-অলৌকিকের মায়াবী আলো-আঁধারি জগৎ, গতি এবং বিপ্রতীপ গতির দ্বন্দ্ব দেখা যায় এই উপন্যাসে। সুদীর্ঘ প্রায় একশ বছরের দেশসমাজের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস দেখা যায় একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। কখনো সলিটারি সেলে শফির আত্মকথন, কখনো বদিউজ্জামানের বয়ান। শফির ক্রমিক রূপান্তর। উপন্যাসের পর্বান্তরের মাঝে উনিশ-বিশ শতকের একটি পীর পরিবার, সামাজিক পট পরিবর্তন, মুসলমান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সুন্দরভাবে চিত্রিত।

বদিউজ্জামানের ক্রমশ একা হয়ে যাওয়ার নিঃসঙ্গতা; মানুষ থেকে অলীক মানুষ হয়ে ওঠার যন্ত্রণা — 'উঁচুতে উঠে গেলে যেন মানুষের সবটুকু চোখে পড়ে না নিচে থেকে। ওরা ভাবে আমার ঘর-গেরস্থালি নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, আমি এক অন্য মানুষ। অথচ আমার মধ্যে এই সব জিনিস আছে। টিকে থেকে গেছে সব কিছুই। আমার কষ্ট, আমার মনে খাহেশ। তসবিহ জপে ভুল হয়... আমার চারদিকে তারপর থেকে হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার... অথচ রাত নিশুতি হলে সেই হুঁশিয়ারির মধ্যেও চাপা হাসিকান্নার মানবিক আর্তি ভেসে আসে... সারা রাত ঘুম আসে না দু'চোখে।'

শফির মুখে শোনা যায় — 'বইটির পাতা উল্টেই একটা বাক্য চোখে পড়ল। চমকে উঠলাম। স্ট্রেঞ্জ লিবার্টি। সত্যই তাই। আমিও প্রকৃতিতে যাই এবং ফিরে আসি অদ্ভুত স্বাধীনতা নিয়ে।' শফির জীবনে যেন বোদলেয়রীয় দর্শন — বিষাদ থেকে বিতৃষ্ণায়, বিতৃষ্ণা থেকে নির্বেদে। নিজে নামহীন ত্রাসে পরিণত এক শিলাখণ্ড মাত্র! সিরাজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মার্কেজের *ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুইড* উপন্যাসের সঙ্গে *অলীক মানুষ* উপন্যাসের কোথায় যেন একটা মিল আছে।'

চার

ছোটগল্প লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর প্রথম জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'তরঙ্গিনীর চোখ'। বিশেষ সাক্ষাৎকারে সিরাজ বলেন, 'এক গ্রীষ্মের দুপুরে আমি সাইকেল চালিয়ে আসছি। এই সময়েই দেখি — মুচি-বায়েনদের একটি মেয়ে ভাগাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে, একটা ছড়ি হাতে আকাশের শকুন সামলাচ্ছে। আর 'বাবা বাবা' করে চেলাচ্ছে। ওদিকে আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে শকুন... এই টুকুন মাত্র আমার নজরে পড়েছে। ব্যস, ওতেই গল্পটা মাথায় স্ট্রাইক করেছে।... মনে আছে গল্পটা লিখে আমি দশ টাকা পেয়েছিলাম। ওটাই আমার লিখে প্রথম রোজগার।' এই গল্পটি ১৯৬২ সালে *ছোটোগল্প* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই একই বছরে, *দেশ*-পত্রিকায় বের হয় তাঁর 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন' গল্পটি। অবশ্যি তার আগে ১৯৬০ সালে *বিংশ শতাব্দী* পত্রিকায় সিরাজের প্রকাশিত হয় 'হিজলকন্যা' গল্প।

তারপর অনেক ছোটগল্প লিখেছেন সিরাজ। 'অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পে দেখা যায় চিরুণী নামে এক কিশোরী মাসির ঘরে যাচ্ছিল নবান্ন খেতে। ধনহরি মোড়ল তাকে পথে একা পেয়ে গুড়মুড়ি খেতে দিয়ে শরীরে হাত দেয়। তারপর বলাৎকারে উদ্যত হলে এক অচেনা মুনসি তাকে রক্ষা করে। সেই ঘটনার পরেও কিশোরী ছুটে যায় নবান্ন খেতে, তার মাসির ঘরে।

'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পে নারায়ণ ওরফে নারাং বাউরির কামচেতনার উন্মত্ততা দেখা যায়। এক বৃষ্টিঝরা দিনে তার শরীরে কামনার আগুন। সে দুবার বিয়ে করলেও তার বউ টেকেনি। তাই বিধবা যুবতী সরলাকে জাপটে ধরে। স্বৈরিণী সরলা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তখন ক্ষুব্ধচিত্তে নারাং ছুটে যায় সরলার বোবা মেয়ের কাছে। তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। সরলার অভিযোগে পুলিশ তাকে জেলে নিয়ে যায়।

সিরাজের 'ভারতবর্ষ' গল্পে মানবিকতাহীন, করুণাহীন সমাজের মর্মান্তিক করুণ চিত্রের পাশে হিন্দু-মুসলমানের

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বান্দ্বিক চিত্র অঙ্কিত। এক বুড়ি তার গাঁয়ে ছিল হিন্দু-মুসলমান সমাজের কাছে অনাদৃতা। অথচ তার হঠাৎ মৃত্যু ঘিরে দুই সম্প্রদায়ের বিতর্ক। হিন্দুরা বলে, বুড়িকে মরার আগে স্পষ্ট বলতে শুনেছি — হরিবোল বলতে। অন্যদিকে মুসলমান পাড়ার লোকজন তখন বুড়িকে ঘিরে আরবিমন্ত্র পড়তে উদ্যত। বুড়িকে নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের তর্কাতর্কি, উত্তেজনা। মারমুখী পরিবেশ। জনতার দুদলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র। তারপর হঠাৎ বুড়ির দেহ নড়ে ওঠে। বুড়ি উঠে বসে। দুদলের প্রশ্ন — বুড়ি, তুমি হিন্দু, না মুসলমান? বুড়ি সবাইকে গালি দিয়ে শেষ রোদের আলোয় দূরে, অনেক দূরে হারিয়ে যায়।

'গাছটা বলেছিল' অসাধারণ ছোটগল্প! গল্পের শুরু — বুড়ি গিয়েছিল গাছটার তলায় পাতা কুড়োতে। গাছটা তাকে বলল, মর্ মর্ মর্। ভয় পেয়ে বুড়ি বাড়ি পালিয়ে এলো, আর মরে গেল।

তারপর তদন্ত শুরু। গ্রামের মানুষ — মোড়ল, শিক্ষক, যুক্তিবাদী সবাই মিলে বলল — হার্ট অ্যাটাকেই বুড়ি মারা গেছে। অথচ ডাক্তার অসীম বোস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে চান। গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে — কথা-বলা-গাছটিকে তিনি চাক্ষুষ করতে ইচ্ছুক। তারপর তিনি গাছের কাছে গিয়ে 'হ্যাল্লো' বলতেই শুনতে পান, গাছটা তাকে বলছে — মর্ মর্ মর্!

পরদিন সকালে অসীম বোসের মৃত্যুসংবাদ আসে। যদিও তাঁর বিছানার পাশে একটুকরো কাগজে লেখা ছিল — আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তিনি নাকি সায়ানাইড খেয়েছেন। কিন্তু কেন? তার উত্তর মেলে না। তার ফলে গাছটিকে বিপজ্জনক মনে করা হয়। পঞ্চায়েত থেকে গাছটিকে কেটে ফেলার কথা ভাবে অথচ কিছু মানুষ গাছটিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে থাকে। হিন্দুপাড়া ও মুসলমানপাড়ার মাঝে নো-ম্যান্স-ল্যান্ডে মাথা-তুলে-দাঁড়ানো গাছটিকে নিয়ে গাঁয়ে রণক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি হয়। এ থেকে বোঝা যায় — কুসংস্কার জিনিসটা একশ্রেণির ভাইরাস, যা মহামারি বাধায়।

সিরাজের একটি কালজয়ী ছোটগল্প 'গোম্পা'। চাষের কাজে বা গরুর-গাড়িতে গাড়িটানা বলদের প্রতি মানুষের সন্তানতুল্য স্নেহ ও দরদ এই গল্পের প্রাণ। হারুন আলির ডাকনাম হারাই। তার দুই প্রিয় বলদ — ধনা ও মনা। চারু মাস্টারের বাড়িতে হারাই আসে। মাস্টারের মেয়ের বিয়ে। তাই গাড়িভর্তি কুমড়ো আর কলাই নিয়ে আসে হারাই। তিন বস্তা ধান নিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ বামজোত ধনা বলদ অসুস্থ হয়। গোবদ্যি পিরিমল হাড়িকে বারোআনা দিয়ে তার মন্ত্রপড়া-জল ধনাকে খাওয়ায়। কিন্তু হতাশ হয়। হারাইয়ের কাছে নিজের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি আদরের ধনা। তাই নিজের সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে ধনার প্রাণভিক্ষা করে। অবশেষে হারাই হতবুদ্ধি হয়ে দিলজানের কাছে ধনাকে বিক্রি করে। গল্পে দেখা যায়, ধর্মপ্রাণ বদর হাজি আন্তরিক মমতায় হারাইকে নিজের ঘরে নেমন্তন্ন জানায়। তারপর কান্নাভরা মর্মান্তিক দৃশ্য : 'হেই হাজিসাব! হামাকে হারাম খাওয়ালেন।... হামাকে হামারই বেটার গোস্ত খাওয়ালেন। হেই হাজিসাব! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গে! এক পদ্মার পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো।' শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প থেকেও এই গল্পের আবেদন তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায় অনেক বেশি হৃদয়বিদারক।

'বাগান' গল্পে দেখা যায়, মা-বাপহারা এক কিশোর হরিবোলা। ধানু মোড়লের ঘরে গোরু চরায়। মনিব ধানু মোড়ল তাকে খ্যাদোড়-হুদমুসলো-ক্যালাগোবিন্দা ইত্যাদি হীনার্থক শব্দে গালি করতে অভ্যস্ত। অথচ গোরু চরাতে গিয়ে প্রকৃতির উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে হরিবোলা স্বাধীনচিত্ত। তখন সে যেন প্রকৃতির সন্তান। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এরকম : 'তার চুলে থাকে ট্যাসকোনা পাখির পালক। তার কাঁধে থাকে শালিক পাখির ছানা। নুড়ি দিয়ে ঘাসফড়িং খোঁজে। কতরকম নাম জানে ঘাসফড়িঙের — ঘরপোড়া, তল্লা, বাজ। রুক্ষ কাঁকরে-ডাঙায় বেটে লাল রঙের ফড়িংগুলো ঘরপোড়া।... লম্বাটে সবুজ ফড়িং দেখিয়ে বলতো — ইগুলান তল্লা। বেঁটে, ধূসর ডানা, তলার দিকটা ফিকে সবুজ আর পেটজুড়ে ফুটকি — ই দ্যাখো মা — বাজ।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহিত্য অকাদেমি ভুয়ালকা পুরস্কার, ডি.লিট সম্মানপ্রাপ্তির পর সিরাজ গাঁয়ে একবার বেড়াতে যান। তখন তাঁর প্রকৃতিপাঠের মহান শিক্ষক কটা শেখের একচালা ঘরে গিয়ে অনেক গল্পগাছা করেন। সাধারণ চাষি কটা শেখকে আজীবন পরম আত্মীয়ের মতন আপন ভাবতেন সিরাজ। তাঁর কাছেই কিশোর বয়সে সিরাজ চিনেছিলেন — লাল পোকা, নীল পোকা, ট্রাসকোনা-হডি-টি পাখি। নানা ধরনের, নানা রঙের ফড়িং।

এই গল্পে বর্ণিত বাগাল অর্থাৎ শিশুশ্রমিক হরিবোলা তার মনিবের কাছে অকথ্য নির্যাতন অসহায়ভাবে সহ্য করে। তারপর খড়ের গাদায় তার সহজ সুখ। তার বর্ণনা এরকম — 'তার লিকলিকে বাহু খামচে ধরে মোড়লমশাই তাকে খড়কাটা কুঠুরিতে ঠেলে

সাধারণ চাষি কটা শেখকে আজীবন পরম আত্মীয়ের মতন আপন ভাবতেন সিরাজ। তাঁর কাছেই কিশোর বয়সে সিরাজ চিনেছিলেন — লাল পোকা, নীল পোকা, ট্রাসকোনা-হডি-টি পাখি। নানা ধরনের, নানা রঙের ফড়িং।

দেয় এবং নিজের বিছানায় ওমে ফিরে যায়। ওপরে খড়, নিচে খড়, মধ্যিখানে কুঁকড়ে পড়ে থাকে হরিবোলা।'

'রানিরঘাটের বৃত্তান্ত', 'দারুব্রহ্মকথা', 'একটি বানুকের উপকথা', 'লালীর জন্য', 'আত্মজ', 'সাক্ষীবট', 'হারাচাঁদের হাসি', 'বর্ণপরিচয়', 'বুঢ়া পীরের দরগাতলায়', 'অক্রূরের গল্প', 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গল্প', 'কাঁটা', 'শরীরী-অশরীরী', 'চম্পাকুমারী', 'জুয়াড়ি', 'গাজনতলা', 'গণেশচরিত্র', 'মানুষের জন্য', 'বাদশা', 'ছোরা', 'আক্রান্ত', 'সোনালি মোরগের গল্প', 'নর্তকী', 'বুনো হাঁসের মাংস', 'সরাইখানা', 'পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'পদ্মবনে মত্তহাতি', 'সাড়ে চার হাত মাটি', 'আন্তর্জাতিক', 'আরব সাগরের সুখশান্তি' ইত্যাদি অসংখ্য ছোটগল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর কুশলী শিল্পসত্তার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমকালীন গল্পলেখকদের থেকে তাঁর স্বতন্ত্রতা ও বর্ণসিদ্ধি অনুভব করা যায়।

পাঁচ

রহস্যকাহিনিমূলক উপন্যাস রচনাতেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অত্যন্ত দক্ষ লেখক। প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। বড়দিনের সান্টাক্লসের মতন সাদা গোঁফদাড়ি। মাথায় টাক। তাকে ঢেকে রাখে টুপি। বিশালাকায় অথচ শক্তিমান। গলায় ঝোলে বাইনোকুলার ও ক্যামেরা। পিঠের কিটব্যাগে থাকে প্রজাপতি-ধরা নেটস্টিক। তাঁকে বিদেশি মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি সজ্জন, সদালাপী বাঙালি। তাঁর শখ দুর্গম, বিপদসঙ্কুল জায়গায় পাড়ি দিয়ে জটিল রহস্য সমাধান করা। ক্রমপর্যায়ে রহস্য-উন্মোচনে তাঁর দক্ষতা মুগ্ধ করে।

ব্রিফকেস রহস্য উপন্যাসের প্রথমেই আছে আকস্মিক রহস্যময়তা। টেলিফোনে হঠাৎ ঘুম ভাঙে নীতার। তাকে ফোনে সতর্ক করা হয় — তিনি যেন আউটডোর শুটিংয়ে চণ্ডিতলার প্রাক্তন এমপি বারীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বাড়িতে পরের দিন না যান। তার অনুরোধেও ডিরেক্টর অবিনাশবাবু লোকেশন স্পট পালটান না। তাই এক বান্ধবীকে নিয়ে তিনি চণ্ডিতলায় যান। সেদিন রাতেই ঘটে হঠাৎ লোডশেডিং ও রহস্যময় বিভ্রাট।

কাহিনির রহস্য জমাট হয়। সৌম্যের কাছে পাওয়া একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনে নায়িকা নীতা সোমের ছবি দেখে চমকে যান বারীন্দ্রবাবু। মনে পড়ে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট ও তার সিটের পাশে-বসা ব্যবসায়ী এস.কে. রায়ের মৃত্যুর কথা। তাঁর ব্রিফকেসে পাওয়া জড়োয়া নেকলেসটি বারীন্দ্রবাবু দিতে চান তাঁর স্ত্রী বা কন্যাকে। তারপর নানা ঘটনা। স্বার্থ-লোভ-বিশ্বাসঘাতকতা। অরিত্রের আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ঘটে চমকপ্রদভাবে।

বোরখার আড়ালে উপন্যাসটি রহস্যকাহিনির টানটান আগ্রহ ধরে রাখে। কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের ব্রাইটন অকশন হাউসের সিন্‌হা ট্রেডার্স নিলামঘরের মালিক অমরজিৎ সিন্‌হার ছেলে বিশ্বজিৎ। তিনি দিল্লি থেকে ফতেগঞ্জের নবাবদের 'সরপেঁচ' (পাগড়ির মূল্যবান অলংকার) সুকৌশলে হাতিয়ে নেন। সেই রত্ন উদ্ধারের জন্য নবাবনন্দিনী জিনাত বেগম বোরখার আড়ালে চন্দ্রপ্রভা নাম নিয়ে ব্যালে নর্তকী হন এবং বিশ্বজিতের মন জয় করেন। ক্রমে তার নাম মিসেস চন্দ্রপ্রভা সিন্‌হা। এসব রহস্যঘটনা ভেদ করেন কর্নেল। বোরখার আড়ালে জিনাত বেগম নবাবি মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেই উদ্দেশ্যসাধন করেছেন।

সিরাজের লেখা *নগ্ন নির্জন হাত, কুয়াশার রং নীল, নীচে নামো, বাঁয়ে ঘোরো, লালুবাবুর অন্তর্ধানরহস্য, হিকরিডিকরিডক রহস্য, প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য, কঙ্কগড়ের কঙ্কাল, অলৌকিক চাকতি রহস্য* প্রভৃতি রহস্যরোমাঞ্চকাহিনি প্রমাণ করে তিনি একজন প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা লেখক। অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত সিরাজের কর্নেল সমগ্র আমাদের সাহিত্যচেতনায় নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

ছয়

বাঙালি লেখকদের অনেকে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন উপন্যাস রচনার পাশাপাশি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নামের সঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নামও এ প্রসঙ্গে করা যায়। [অনুরূপভাবে কবিতা লেখার পাশাপাশি উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ অনেকেই।]

একদা *দেশ*-পত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'শেষ অভিসার' কবিতাটি থেকে প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা যায় — 'তারো মনে সাধ ছিল শিল্প রচনার/ এই মাটি নিভৃত যৌবনে/ এইসব শ্যামল ঘাস... নদী মাঠ সুদূরে উধাও/ ভিজে গেছে তারই অশ্রুপাতে/ পউষের সোনাধানে কীট কণ্ঠে, অশ্রান্ত নূপুরে/ পতঙ্গের নাচে/ তারো মনে সাধ ছিল স্বপ্ন রচনার।'

লক্ষণীয়, তিরিশ বছরের যুবক সিরাজের ওপর কবি জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের প্রভাব। জীবনানন্দের মতন সিরাজও যেন রূপসী বাংলার কবি!

মনীষী আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে প্রথম যৌবনে আলাপসূত্রে সিরাজ পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই অন্তর প্রেরণায় পল রোবসনের গান সিরাজকে মুগ্ধ করে। যার প্রকাশ 'পল রোবসনকে' কবিতাটি। ১৯৫৮ সালে লেখা।

লোকনাট্য আলকাপের স্মৃতি ফুটে উঠেছে সিরাজের 'এখনও ভাবতে অবাক লাগে' কবিতায় — 'দীর্ঘকেশী আফ্রোদিতি বানিয়েছিলাম যত্ন করে/ বলেছিলাম ভালোবাসি, এখন ভাবতে অবাক লাগে।... অর্ধনারীশ্বরের পাশে রাত্রিযাপন পণ্ডশ্রম স্বপ্নসম/ ভরাট পাছা, নির্মিত স্তন, বিকল্প এক আফ্রোদিতি/ হঠাৎ দুঃখে শুকনো ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলেছিল/ আমিই সেই কিংবদন্তী কল্পকথার গেঁয়োপরী/ পুরুষ হয়ে জন্মেছিলাম অভিশাপে স্বভাবদোষে।'

গত শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা কবিতায় প্রবল যৌবনের সাড়া-জাগানো পত্রিকা *কৃত্তিবাস*। যার প্রাণপুরুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও সহযোগী তাঁর কবিবন্ধুরা। সেই কৃত্তিবাস পত্রিকায় সুনীল-শক্তির সমকালীন সিরাজ লিখেছেন একাধিক কবিতা। ১৯৬৪ সালের শারদীয় *কৃত্তিবাস*-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সিরাজের 'বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে' এবং 'বৈদ্যুতিক' কবিতা দুটি। লক্ষণীয়, কবিতা দুটিতে সমকালীন কবিদের মতন সিরাজ ধূসর বেদনা, প্রেমের বিপন্নতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যথা — 'বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে/ নদীর পোলের নীচে হাহাকার/ কে যেতে পারবে দূরে, স্টেশনের নাম মনে নেই/ বিবর্ণ ট্রেনের ঘরে অপর্ণার অর্পিত শরীর ছিল।'

সিরাজের 'বৈদ্যুতিক' কবিতায় একটি লাইন — 'কাঠের কারখানা আছে ঘূর্ণমান বিজলি করাত।' এই লাইন যেন মনে আনে মলয় রায় চৌধুরীর কবিতা।

সিরাজের 'ট্রিলজি' কবিতায় অবশেষে 'মরাল', 'মায়া', 'এবং বুড়ো হাতিটা', 'মেয়েটি', 'নির্গতিক', 'যাবার ইচ্ছে ছিল', 'জলছবি', 'মূর্খের শহরে' প্রভৃতি কবিতা তাঁর সংবেদনশীল কবি

চেতনার পরিচয় দেয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'আধুনিকোত্তর সময় ও কবিতা' প্রবন্ধটি তাঁর কবিতাবিষয়ক ভাবনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বিদেশি কবি ও লেখকদের বই নিয়মিত পড়তেন, তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে। যথা, 'কবিতায় সব কথা বলা যায় না বলেই না বোদলেয়ারকে ছবির ছুতো ধরে গদ্যে নামতে হয়েছিল। ছবি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ গদ্যগুলি আমাদের ভাবায়।... উডি অ্যালেনের (যিনি কমেডিয়ান বলে খ্যাত) *মুন ডাল্ট* নামে একটি ছবি দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, কবিতা আর ফিকশন সুররিয়ালিস্ট ব্যঞ্জনায় অস্পষ্টভাবে হাত মিলিয়েছে। আবার দর্শনের মতো জটিল ও দুরূহ বিষয়ও চলচ্ছবিতে কিভাবে প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারে, তার নমুনা কুব্রিকের 'টু থাউজান্ড স্পেসওডিসি'তে কি আমরা দেখিনি?'

এই প্রবন্ধে সিরাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, 'আমি হয়তো জীবনানন্দীয় অর্থে কবি নই। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, কবিতা আমার পিছু ছাড়েনি। এখনও ছাড়েনি। যখন গল্প আসে না, উপন্যাস লিখতে গিয়ে হাত ঘেমে যায়, তখন একটা ব্যর্থতার যন্ত্রণা কবিতার ভূতকে কাঁধে বসায়। তাই আজও কবিতা লিখি। কিন্তু ছাপতে দিই না। কারণ, এগুলি আমার ব্যক্তিগত আচরণমাত্র।'

২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে সিরাজের *কথামালা* গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে মুসলিম নারী ও সিজোফ্রেনিয়া লেখায় লেখকের প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রথম বিমানচালক রুকসানার পাশে এ-পার বাংলার বীরভূমের খায়রুন্নিসার কথাও তিনি বলেছেন।

'বঙ্কিমচন্দ্র এবং মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে সিরাজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'শ্রীরামকৃষ্ণের নামাজ-পড়া', 'কথামৃত এক ধ্রুপদী সাহিত্য', 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ', 'ইসলাম প্রসঙ্গে' প্রভৃতি গদ্যরচনায় সিরাজের স্বকীয়বোধের পরিচয় ফুটে ওঠে।

'কবিতায় দিয়োজিনিস' রচনায় কবি বিনয় মজুমদারের কবিত্বশক্তি তথা মেধার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন সিরাজ। এছাড়া সত্যজিৎ রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনার পাশে 'ক্রিকেট অ্যান্টি ক্রিকেট' লেখাটি আমাদের মুগ্ধ করে।

বহুমুখী সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন স্থিতধী, নম্রভাষী, আত্মপ্রচারবিমুখ, পরিবার-পরিজনপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল মানুষ। শিকড়সন্ধানী চেতনায় আমৃত্যু। তিনি জন্মস্থান তথা গ্রামজীবনের সঙ্গে যোগ রেখেছেন। সাধারণ জীবনের শরিক হওয়ার বাসনায় একদা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের দেওয়া কলকাতার সল্টলেকের বিশাল আবাসন ছেড়ে তিনি পরিচিত বেনিয়াপুকুরের ঘরোয়া পরিবেশে ফিরে এসেছেন এবং আমৃত্যু থেকেছেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছায়, প্রয়াণের পর তিনি চিরশান্তির দেশে ফিরে গেছেন প্রিয় জন্মভূমির মাটিজল বাতাসের মাঝে। দ্বারকানদী, গহীন তৃণভূমির গায়ে হিজলবন, ট্যাস্কনা-হট্টি-ডি-দোয়েল পাখি আর প্রিয় নিমগাছ তাঁকে আজো ভালোবাসে — ছলছল তরঙ্গে সবুজের স্নিগ্ধ মায়ায়, আর পাখির কলগীতির মাঝে দোয়েলের সুরেলা শিসে! ❐

কথা সাহিত্যিক

— আনিস চৌধুরী —

পঞ্চাশের দশকের সৃজনশীল মানুষ আনিস চৌধুরী। পেশাগত জীবনে সংবাদপত্র ও বেতারের সাংবাদিক, সাহিত্যের তিনটি শাখায় দৃপ্ত পদচারণা করেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাঁর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি। তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাটক রচনায়। নাটকের জন্য তিনি ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। মঞ্চ, টেলিভিশন ও বেতার নাটকে তিনি এ দেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুষঙ্গকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে তাঁর সৃজন-উৎকর্ষ ক্রমে উত্তরণপ্রয়াসী এবং জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

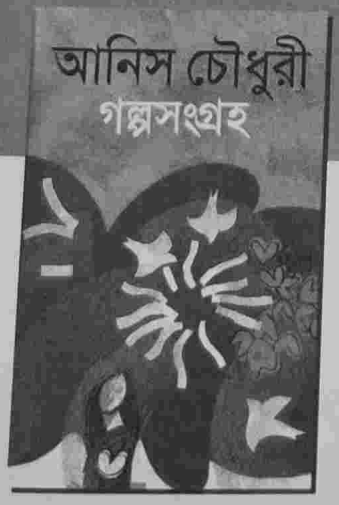

প্রকাশিত
তিনটি গ্রন্থ

দ্বাদশ বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা । জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

কালি ও কলম

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক
মাসিক পত্রিকা